চিন্তা
সাহিত্য ও মেধা চর্চার উন্মুক্ত ঘর

রাহুল দাশগুপ্ত
সম্পাদিত

মাধবী মুখোপাধ্যায় রূপম ইসলাম পবিত্র মুখোপাধ্যায় অভিজিৎ সেন রবি সেন
দিবাকর ভট্টাচার্য মলয় রায়চৌধুরী অবনী ধর প্রভাত চৌধুরী গৌতম বসু
অমর মিত্র বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র প্রামাণিক মিহির সেনগুপ্ত সুধীর দত্ত
মৃণাল ঘোষ রঞ্জন প্রসাদ রঞ্জিত সিংহ দেবদাস আচার্য দেবর্ষি সারগী
সমীরণ দাস শুভঙ্কর গুহ সন্মাত্রানন্দ রণবীর পুরকায়েস্থ সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
প্রথম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ শারদীয়া ২০১৯ ॥ সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

সাক্ষাৎকার

মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ৫

প্রসঙ্গ: রূপম ইসলাম একক ১২

গদ্য

আমার শৈশবযাত্রা ॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ২৪

আমি কিভাবে কবিতা লিখি ॥ প্রভাত চৌধুরী ২৭

আমার খেলা যখন ছিল: দৌহিত্রের স্মৃতিচারণে তারাশঙ্কর ॥ বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ৩২

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' বিষয়ে ॥ অভিজিৎ সেন ৩৫

কবির নিয়তি ॥ গৌতম বসু ৩৯

কেন নাটক? ॥ রামচন্দ্র প্রামাণিক ৪৬

উপন্যাস লেখা ॥ অমর মিত্র ৫২

আমার লেখার অবলম্বন ॥ মিহির সেনগুপ্ত ৫৮

আমার কবিতাভাবনা ও কবিতা ॥ সুধীর দত্ত ৭২

রবীন মণ্ডল: ১৯৬০-এর দশকের প্রধান এক শিল্পী ॥ মৃণাল ঘোষ ৮৪

আমার উপন্যাস ভাবনা ॥ দেবর্ষি সারগী ৮৮

মাটির পোকা: ভাঙা ভাঙা আখ্যানের নিয়তি ॥ শুভঙ্কর গুহ ৯১

গণভোটের দেশভাগ ॥ রণবীর পুরকায়স্থ ৯৫

কেউ নেই— শূন্যতা ॥ রঞ্জন প্রসাদ ১০০

'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র ভিতরবাড়ি ॥ সন্মাত্রানন্দ ১০৩

তারকোভস্কির সিনেমা ॥ উজ্জ্বল সিংহ ১১৩

অক্ষয় মালবেবি: গাছ ও ধর্মের নীচে বসে আছে অক্ষরপুরুষ ॥ তৃষ্ণা বসাক ১১৭

লেখাখেলার গোলকধাঁধা ।। গৌতম মিত্র ১২৪

গল্প ১

জুতোর এক পাটি কার দিকে উড়ছে ॥ রবি সেন ১৩৫

তুচ্ছ ।। দিবাকর ভট্টাচার্য ১৪০

লন্ডন ॥ অবনী ধর ১৪৫

তালতোড় অভিযানের খুটিনাটি ॥ বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ১৫৭

বুড়ো ॥ সমীরণ দাস ১৬৭

জলে পাপ নেই ॥ অসিত কর্মকার ১৭৪

প্রতিপক্ষ ॥ শঙ্করনাথ চক্রবর্তী ১৮৬

ওয়েস্টল্যান্ড থেকে অন্নপূর্ণাধাম ॥ শ্রীধর মুখোপাধ্যায় ১৯০
শয্যাতলে ॥ সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫

**কবিতা** ২০৯-২১৭/২২৩-২৩০

রঞ্জিত সিংহ • দেবদাস আচার্য • সৈয়দ কওসর জামাল • সমীরণ ঘোষ • নাসের হোসেন
সোমক দাস • নাসিম-এ-আলম • অমিতাভ নাগ • সমরেশ মুখোপাধ্যায় • শাশ্বতী মিত্র
দেবজ্যোতি রায় • সেলিম মণ্ডল • শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায় • শতানীক রায় • রূপায়ণ ঘোষ
বিজয় দাস • অনিন্দিতা গুপ্ত রায় • অভিজিৎ রায় • রুদ্রদীপ চন্দ • মোহিত তন্ময়
কৌশিক বাজারী

**দীর্ঘ কবিতা** ২১৮

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

**অনুবাদ কবিতা**

গিয়ম অ্যাপলিনেয়ার-এর কবিতা ॥ মলয় রায়চৌধুরী ২৩১
আলেখান্দ্রা পিসারনিকের কবিতা ॥ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ২৩২

**গল্প ২**

বই বাঁধাই ॥ অর্ক চট্টোপাধ্যায় ২৩৪
বিকল্প ॥ গৌতম দে ২৩৮
দাদ ॥ তন্বী হালদার ২৪০
সার্কেল ডান্স ॥ নীলিম গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৭
মাচিনদা ॥ জয় ভদ্র ২৫০
পর্চা ॥ অভিষেক ঝা ২৫৭
নক্ষত্র ও উত্তরাধিকারী ॥ শান্তনু ভট্টাচার্য ২৬১
পাখি গ্রাম ॥ রিপন হালদার ২৬৯
আশ্চর্য সিঁড়ি ॥ রাহুল দাশগুপ্ত ২৭৫

**গ্রন্থপাঠ**

অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর কবিতা ॥ বিমল দেব ২৮২
সূর্য যখন মেষ রাশিতে ॥ তৃপ্তি সান্ত্রা ২৮৫
কথার ভাবরূপ ॥ শতদল মিত্র ২৯১
চিরহরিৎ আগুনের সন্ধানে নিজের দিকে যাত্রা ॥ উপল মুখোপাধ্যায় ২৯৬
সুজয় মোদকের গল্পগ্রন্থ ॥ স্বপন চক্রবর্তী ৩০১
পুরাণপুরুষ সম্বন্ধীয় ॥ পাতাউর জামান ৩০৫
ভাতপুরাণ: মানুষের বেঁচে থাকার অনির্বাণ অ্যাডভেঞ্চার ॥ শময়িতা চক্রবর্তী ৩১০
'যখন কেউ হত্যাকারী হয়ে ওঠে': রাহুল দাশগুপ্ত-এর একটি সম্পূর্ণ থ্রিলার ॥ শীর্ষেন্দু দত্ত ৩১৪
রাহুল দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি ৩১৭

# সম্পাদকীয়

কয়েকটি বিশেষ কারণে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে লেখকদের বলার জায়গা ক্রমেই কমে আসছে। তাদের কিছু কিছু সাক্ষাৎকার ছাপা হয় ঠিকই। কিন্তু তাঁদের আরও অনেক কিছু বলার থাকে। তাদের কিছু কিছু কাজ নিয়ে হামেশাই আলোচনা হয়। কিন্তু অন্য বইগুলি, একইরকম গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, হয়তো সেভাবে আলোচিত হয় না। এই সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নেপথ্য কাহিনি নিয়ে লিখেছেন। কেউ বা লিখেছেন জীবনের কোনও অমূল্য স্মৃতি নিয়ে। এই কাজটি জরুরি বলেই মনে হয়।

বিভিন্ন মিডিয়ায় লেখকদের আরও বেশি করে ডাকা উচিত। তাঁদের কথা শোনা উচিত। প্রবীণ-নবীন নির্বিশেষে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখককে। একটা বইয়ের গড়ে ওঠার পিছনে থাকে কত অলিখিত ইতিহাস। সেগুলো মানুষের জানা দরকার। কেউ বা লিখেছেন নিজেদের সাহিত্য-দর্শন ও জীবন-দর্শন নিয়ে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কবি ও লেখকের অন্তর্জগতকে বুঝে নেওয়ার জন্য যা জরুরি...

গল্প ও কবিতার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে নতুন আইডিয়ার ওপর। ভাষা, বিষয়, আঙ্গিক ইত্যাদি নানা দিকে নতুনভাবে ভাবার ওপর। একমাত্র নতুন নতুন আইডিয়াই বাংলা গল্প বা কবিতাকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। পাঠকের কাছে এই নতুন আইডিয়াগুলো পৌঁছনো দরকার। গতানুগতিক পথ ছেড়ে যারা নিজেদের মতো করে পথ করে নিতে চেয়েছেন বা চাইছেন, সেই নতুন পথের খোঁজ পাঠকের কাছে থাকা দরকার।

গত কয়েক দশকে নিঃসন্দেহে বাংলা গল্প-কবিতা নতুন নতুন বাঁক নিয়েছে। অভিনব সব চেষ্টা হয়েছে। অভিনবত্ব অর্থাৎ নতুন আইডিয়ার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে এই সংখ্যায়। আর রয়েছে কিছু অগ্রন্থিত লেখা। কিছু প্রবীণ লেখকের লেখাও আছে। এইসব লেখাতেও আছে মৌলিক

উৎসর্গ
শ্রী সন্দীপ দত্ত-কে


সম্পাদক
রাহুল দাশগুপ্ত

সহযোগিতায়
শময়িতা চক্রবর্তী
শুভব্রত নন্দী
জয় ভদ্র
শঙ্করায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণাংশু ভট্টাচার্য
রঞ্জন ভট্টাচার্য
শুভঙ্কর গুহ
রামচন্দ্র প্রামাণিক
পলাশ ভদ্র
এবং
ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়

নামাঙ্কন
বিজয় দাস

প্রকাশক
দেবস্মিতা দাশগুপ্ত
উপাসনা দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ
রবীন মণ্ডল

ঋণ: রবীন মণ্ডলের পরিবার
ও ক্যালকাটা পেইন্টার্স



১৩ শহিদ বিনয় বসু রোড
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০
debasmitarahul@gmail.com
9674189106
9231527503

আইডিয়া। উদ্ভাবনী শক্তি। নতুন ভাবে বলতে চেয়েছেন তারা। নতুন চোখে দেখতে চেয়েছেন। তাই এগুলিকে জরুরি মনে হয়েছে।

আর আছে বুক রিভিউ। প্রতি বছর বাংলা ভাষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়। তাদের অধিকাংশেরই কোনও রিভিউ হয় না। বই নিয়ে মননশীল রিভিউ হওয়া অত্যন্ত দরকার। নতুন প্রকাশিত বইগুলো সম্পর্কে খোঁজ রাখা দরকার। সেগুলো নিয়ে আলোচনা ও মত-বিনিময় হওয়া জরুরি। এটি কোনও ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি সক্রিয় কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই মনে হয়।

এটা না হলে, কীসের প্রেরণায় একজন লেখক তার সৃষ্টিশীলতাকে সচল রেখে যাবেন? আলোচনার মধ্য দিয়েই তো ত্রুটি-সাফল্য ধরা পড়ে, স্বীকৃতি আসে। এই সংলাপের পথই যদি না থাকে, তবে কীসের ভরসায় একজন লেখক নিজের পরবর্তী লেখাটি লিখতে উৎসাহিত হবেন? ফলে বুক রিভিউয়ের ওপর জোর দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। যদিও সাফল্য এসেছে যৎসামান্য। আরও অনেক আলোচনা রাখতে পারলে যথাযথ হত। নতুন নতুন যেসব কাজ হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে, অত্যন্ত নিয়মানুবর্তীতার সঙ্গে তাদের ভূমিকাকে সঠিকভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে।

সিনেমা, গান, চিত্রশিল্প-ইত্যাদিও রয়েছে এই সংখ্যায়। রয়েছে দুই বিশিষ্ট শিল্পীর সাক্ষাৎকার। তিন তরুণ চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি। এখন বলা হয়, কোনও টেক্সটই মৌলিক নয়। সব টেক্সট-ই একটা ইন্টারটেক্সুয়ালিটির অংশ। সুতরাং সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবলে চলবে না, তাকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার সঙ্গে। তাদের পারস্পরিক আদানপ্রদান ও বিনিময়কে বোঝার মধ্য দিয়েই একটি বিশেষ সময়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়াকে বোঝা সম্ভব। মননশীলতার সঠিক চর্চার জন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিরন্তর যোগাযোগ ও বিনিময় খুবই জরুরি, যাতে একে অপরের সাহচর্য ও শুশ্রূষায় ধারাবাহিকভাবে তারা পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়।

আর রয়েছে কিছু চিঠি। কিছু চিঠি অনেকদিন ধরেই খুব যত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এগুলোর সাহিত্যমূল্য ছাড়াও, ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। চিঠিগুলো আমাকে লেখা বলে নয়। কিছু বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্য-ভাবনা এবং নান্দনিক বোধ বোঝার ক্ষেত্রেও সেগুলো দরকারি। তাদের কেউ কেউ এখন প্রয়াত। তখনও আমি 'অরিন্দম দাশগুপ্ত' নামে লিখি এবং 'এবং সমুদ্র' নামে নব্বই দশকের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা সম্পাদনা করি। এই চিঠিগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, মানুষ পাঠ করার সুযোগ পান, তাই এখানে প্রকাশ করা হল।

সব মিলিয়ে এটি একটি খুবই ক্ষুদ্র প্রয়াস, আমার অতি সীমিত সাধ্যের মধ্যে করা। অসম্পূর্ণ এবং অমীমাংসিতও বটে। নিরন্তর কাজ করার তাগিদ বোধ করছি। যদিও এখনই বছরে একটার বেশি করা সম্ভব নয়। তবে এই প্রয়াসের পিছনে আছে কিছু নির্দিষ্ট ভাবনা। প্রথম সংখ্যাতেই যে সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। যারা এই সংখ্যার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত হয়েছেন, যারা ভবিষ্যতে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবেন, কোনও কারণে এই সংখ্যায় হয়ে ওঠেনি, তাদের সবাইকেই আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানাই...

রাহুল দাশগুপ্ত

তৃপ্তি সান্যা

# সূর্য যখন মেষ রাশিতে

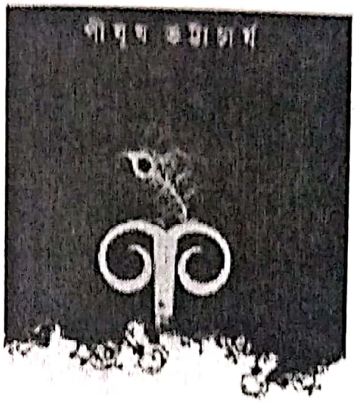

সূর্য যখন মেষ রাশিতে

আগেভাগে মানে পড়তে পড়তেই সাহিত্যিক সৃষ্টির মর্ম উদ্ধারের তাৎক্ষণিক উদ্দীপনায় না-যাওয়া ভালো। পড়ছি 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' পীযূষ ভট্টাচার্য-এর উপন্যাস।

বাড়ি থেকে বেরলেই উত্তরপোতার ঘরটি দখল হয়ে যাবে পিসির। দখল করবে খইমুদ্দিন। কিন্তু মজিদ মাস্টারের বাড়ির এই যাত্রাপথে যেহেতু খইমুদ্দিন সঙ্গে আছে পিসি সেহেতু নিশ্চিন্ত।

১৯৫০-'৫২ সালের প্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তান পাশপোর্ট চালু হওয়ার সময়কালে বগুড়া-সৈয়দপুর-রংপুর-হিলি-পার্বতীপুর লাগোয়া এলাকার কাছাকাছি কোনও এলাকা।

ছেড়া মানচিত্রের কুশীলবদের নিয়ে নিটোল কোনও কাহিনির মায়া নির্মাণ লেখকের অভিপ্রায় ছিল না। কিছু ছবি। কিছু ধ্বনি। লোকগান কিছু। কিছু লোক ক্রীড়া। লোকবিশ্বাস। আশ্বিনের ঝড়, উত্তরপোতার ঘর, ক্যানেস্তারা, লিচুগাছ, কাকাতুয়া, বানর, দেওয়ানিহাট স্টেশন, রহমের দণ্ড, সোনার জলে লেখা জুরি সাহেবের পেনাল কোড, রক্তদহ বিলের মাছ, ঝাড়ু (কালো টুপি মাথায় দিয়ে মজনুশাহ ফকিরের শিষ্যরা যেন) সবাই চরিত্র। ভাগাভাগির সময় শুধু ব্যক্তি মানুষ নয়— তার যতটা শিকড়, যতটা ডালপালা, যতটা আকাশলীন মগ্নতা, যতটা মেঠোগান লোকাচার। ততটাই দেওয়ান গাজির মাজার, নীলবর্ণ ময়ূর পালক, কালু মিয়ার কিস্‌সা বানর আব্দুর— সবাই এই আখ্যানের শিরা, ধমনী।

'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' উপন্যাস বারোটি অধ্যায় নয়, সঞ্চারণে বিভক্ত... সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমনই সঞ্চারণ। মেষ রাশিতে, সূর্যের অবস্থান খাড়া মাথার ওপরে। এক দগ্ধ সময়ের কাহিনি এ উপন্যাস জল রঙে আঁকা। শস্যশ্যামল বাংলা। নদী খেত দিঘি চর বালুতে খুন সব সময় লাল নয়— নীল ও সবুজ। পিসি, প্রাণেশ, জাফর মিঞা, মোয়াজ্জিন, খইমুদ্দিন ফকিরের সঙ্গে পিসিমার মৃত জুরি স্বামী, মৃত আমিনা— সবাই সূক্ষ্ম শরীরে আবহমানকাল ধরে বহমান। প্রতিষ্ঠিত ও মান্যের সঙ্গে গরিবগুর্বোর সহবস্থান ও লড়াই। খুব শ্রেণি চেতনার তুলাদণ্ডে পাল্লা ঠিক রাখার প্রয়াস নয়। এই আবহমানতার মাঝে উপমহাদেশ দু'-টুকরো হয়ে গেছে। যে খইমুদ্দিন দেশভাগের আগে 'আজ্ঞে' বলে সাড়া দিত সেই এখন উত্তরে 'জি' বলে।

প্রাণেশও সে-দেশে থাকতে থাকতে কখনও 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণ করে না। বড়োজোর হিন্দুস্থান, বেশিরভাগ সময়েই সচেতনভাবেই বলে 'ইন্ডিয়া' (পৃ.১৮), তবু কি আশ্চর্য! বেঁচে থাকার খেলাধুলায় খইমুদ্দিন, মজিদ মাস্টার, কালু মিঞা, জাফর মিঞা, পিসিমা, পঙ্কজ, প্রাণেশ, সতীশ দারোগা, ফণীশ্বর সবাই সহযাত্রী। দখল-ভোগ-মালিকানা উচ্ছেদের বয়নে যে। মানব জমিন সেখানে উচ্ছেদ, জাতি দাঙ্গার দগদগে মিনিটস্ ডিটেলস্ নেই।

অষ্টম সঞ্চারণে পাঠক পড়েন দেওয়ানিহাট স্টেশনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে গেছে ততদিনে। অবিশ্বাস্য ঘটনাটি 'রায়ট' বা 'দাঙ্গা'। স্টেশনে, ট্রেনের কামরায় হত্যালীলা। যে-হত্যালীলার ডিটেলস্ নেই। হত্যা পরবর্তী একটি ট্রেন। একটি প্ল্যাটফর্ম। দাঙ্গার দুঃস্বপ্ন এখনও কাটনি... 'ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতেই স্টেশনটি ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবার অবসাদে ধুঁকতে ধুঁকতে বেলা দশটা অবধি ঘুমিয়ে নেয়। স্টেশনটি দুঃস্বপ্ন ভুলতে চায়। ইঞ্জিনের হেডলাইট ছাড়া সমস্ত ট্রেনটি অন্ধকার, এমনকী ইঞ্জিনের কেবিনেও কোনও আলো নেই...', অসম্ভব দক্ষতায়, স্রষ্টা শিল্পীর নির্লিপ্ততায় আঁকা ছবি। কথাকারের তপতপে হৃদয়কে অনুভব করেন পাঠকও:

> 'দিনরাত্রি হেডলাইট একনাগাড়ে জ্বলে নিভে যাওয়ার কিছুদিন পর বোঝা যায় কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে আগুন বন্ধ হয়ে স্টিম হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা ইঞ্জিনের সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে বলেই কোনও শব্দই আসছে না। ইঞ্জিনের মৃদু শ্বাসের শব্দ থেমে যাবার পর কামরায় কামরায় জমাট রক্ত শুকিয়ে যাবার একধরনের চড়চড় শব্দ উঠে আসছে এবং মানুষের রক্ত শুকিয়ে যাবার এরকম বিকৃত শব্দ হতে পারে তা ছিল ধারণাতীত। একদিন আবিষ্কার হয় এক একটি কামরা থেকে এক-এক ধরনের চড়চড়ানি শব্দ উঠে আসছে যাকে কেবলমাত্র কান্না-বিলাপ-আর্তনাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাও একদিন বন্ধ হয়ে গেলে নিখোঁজ চালককে ঘিরে একটি গল্প তৈরি হয়ে কারও কারও কাছে গল্পের দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেয়। ইঞ্জিনের চালক সেদিন এক দৌড়ে চলে গিয়েছিল দেওয়ানের মাজারে চিরাগ জ্বালাতে। চিরাগের শিখা থেকে নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়ে আরও একটি চিরাগ হয়ে যায়। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার

গল্পের মধ্যে চালকের আর্তনাদ থাকুক বা না থাকুক যে এই সব দৃশ্য দেখে তার নিজস্ব আর্তনাদ থাকেই।

চিরাগ রহমের দণ্ড ময়ূরের পালক পাখা, ক্যানেস্তারা... এই সবই যেন এক-এক প্রেক্ষিতে এক-এক রকম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ।

উপন্যাস শুরু হয়েছে পিসি, পঙ্কজ আর খইমুদ্দিনের অভিযান দিয়ে— মজিদ মাস্টারের বাড়িতে যাওয়ার অভিযান। পঙ্কা বা পঙ্কজের মামস হয়েছে। তার বাবা প্রাণেশ ওষুধও খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু পিসির ঘোষণা— মৌলভির কাছে শেখা উর্দুর খটোমটো শব্দগুলো উচ্চারণের জন্য পঙ্কার মামস হয়েছে। এর একমাত্র হিন্দু ওষুধ বানরের এঁটো আম গলাধঃকরণ। অনেক বাহানার পর মজিদ মাস্টারের মর্জিনা নতুন আমের লোভে, মুখের এঁটো আম ছুঁড়ে ফেলে দিলে সব গোল মেটে। মজিদের হাত থেকে আম নিতে হল না— 'বানরের ফেলে দেওয়া এঁটো আমি কুড়িয়ে নেবার সময় পিসি ভাবে একদিক থেকে ভালোই হল, ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে আমটিও রেহাই পেল শেষ পর্যন্ত।'

এই ভাবে বর্ণ হিন্দুর পাশে মুসলমান ও নমঃশূদ্রর গলাগলি বাস। নতুন আবহাওয়ার, বন্দোবস্তে শিশু বেড়ে ওঠে নিজের আনন্দে: 'চান্দ মামা দূরকে/বুইয়ে পাঁকায়ে বুরকে/ আপখায়ে থালিমে/মুন্নে কো দো পেয়ালিমে'—

আবার কখনও মহরমের মিছিলে ইসমাইলদা 'হায় হাসান' বললে পঙ্কা বলে ওঠে 'হায় হোসেন'। এই পঙ্কজের উদ্ভাবনা শক্তিতে তৈরি হয়েছিল ইস্কুলের সরস্বতী মূর্তি। পশ্চিম পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ— আর পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপে দেবী সরস্বতী খুব প্রশংসিত হয়েছিল এই ভাবনা। ভাগ হলেও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা তো বাংলা! স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র পছন্দ করেনি এ বেয়াদপি। পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপের মধ্যে সরস্বতী থাকা মানেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পুজো করা। উর্দুকে অপমান করা। স্কুল এবং পঙ্কজকে থানা অবধি দৌড় করায় রাষ্ট্র। এই ঘটনায় প্রেক্ষিতে ১৯৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত'র— বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব, ১৯৪৮-এর ২১ মার্চ রমনা ময়দানে জিন্না সাহেবের ভাষণ 'Urdu only Urdu shall be national and state language of Pakistan and none else.'— ফজলুল সাহেবের প্রতিবাদ, লাঠিচার্জ— এসবের উল্লেখ আছে।

প্রাণেশ মোক্তারের দিদির স্বামী জুরি সাহেব মৃত। সেই মৃত স্বামীকে ঘিরেই পিসি তার নিজের জীবনটা এমনভাবে তৈরি করে নিয়েছিল... 'তার মধ্যে বোঝাতে চাওয়া ছিল মৃতরাও জীবিত হয় যদি তাদের অনুসরণ করা যায় ঠিকঠাক'— মৃত স্বামীকে চারবেলা খাবার পরিবেশন করেন পিসি। বেড়াল, ইঁদুর সে-সব খায়। কিন্তু পিসির স্থির বিশ্বাস জুরি সাহেব খান। জুরি সাহেবের লিচু গাছের ফল যাতে কেউ খেতে না-পারে, তার জন্য খইমুদ্দিন পাগলের মতো ক্যানেস্তারা বাজায়। লিচু যা পিসি নিজেও খান না, গয়ায় উৎসর্গ করেছেন।

তার উঠোনে দাঁড়িয়ে খইমুদ্দিনকে শাসিয়ে গেছে মোয়াজ্জিন— খপরদ্দার আজানের টাইমে ক্যানেস্তারার ঢঙঢঙানি করবি না। মোছলমান হইয়া কুনো ইমানের শিক্ষা নাই। তার উঠোনে দাঁড়িয়ে তার লোককে ধমকাছে। খইমুদ্দিনকে বলা তো নয়, তাকেই বলা। মোয়াজ্জিনের গলার চেয়ে আরও এক ধাপ গলার পর্দা চড়িয়ে খইমুদ্দিনকে হুকুম চালায় পিসি 'এক্ষুণি ঘন্টা খোল'। সামন্ততান্ত্রিক জোতদারি মেজাজ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তবু সংখ্যালঘু মানুষের দার্ঢ্যতা— পিসিকে বর্ণময় করে তোলে।

মোক্তার প্রাণেশের স্ত্রী প্রভার বাবা শৈলেশ্বর স্বাধীনতা সংগ্রামী। রেল ডাকাতি করে আন্দামানে বন্দি। আন্দামানের সেলেই কমিউনিস্ট হওয়া। ব্রিটিশরা টের পেয়ে স্লো পয়জন করে তাকে। স্বাধীনতার পর, বিপ্লবী শৈলেশ্বর, আশ্রয় নেন এপার বাংলায়, ব্রিটিশ বাংলোতে। আন্দামান, স্লো-পয়জন, মরফিয়া-কোরামিন ব্যর্থ প্রতিরোধ, তিলে তিলে মৃত্যু... কমিউনিস্ট নির্মূল করার প্রক্রিয়া কিছু আঁচড়ে আনা হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তার চাননি লেখক।

সাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তী উপমহাদেশের ভাগ্যলিপির যথাযথ দলিল দস্তাবেজ, কথা কথকতা কই? প্রতিষ্ঠিত একটি হিন্দু পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসছেন। তারা শুধু উদ্বাস্তু নন, তাদের ঘিরে যে মানুষরা তারাও আশ্রয়হীন-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়তা।

> " 'সিরাজউদল্লা' পাল্লায় মহেশ নবাবের পার্ট ভুলে যায়, তবু তার মতো নায়ক কোথায়? ধন্বন্তরী রণেশ ডাক্তার, মোক্তার প্রাণেশকে ওপারে খেদালে, তাদের দেখবে কে। আগে একটা রণেশ ডাক্তার বা প্রাণেশ মোক্তার তৈরি হোক, তবে ভাবা যাবে... বাড়িটা লুঠ হবেই এই রকম একটা খবর ছিল। সতীশ দারোগা রফা করতে বলেছিলেন। কিন্তু ডাকাত কাল্লু মিঞা নগনাকে যেভাবে ভিটে ছেড়ে দিল প্রাণেশ, দারোগার ধারণার বাইরে, রফা ভাবলে রফা, পুনর্বাসন ভাবলে পুনর্বাসন। ডাকাতি আর দাঙ্গা এক নয়— এই মানুষটা বোঝে বলেই এটা করতে পেরেছে। কালু মিঞা নগনা কোনোদিনই দাঙ্গা বাধাবে না এটা ওর মতন ভালো করে বোঝেই না কেউ।"

সেই ভরসায় ইকবাল নয়, কালু মিঞার দখলে বাড়ি। নগনা করে দেবমন্দির দেখভাল ও দুর্গাপুজো। প্রাণেশ মোক্তার সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে দেওয়ান গাজিকে। প্রাণেশ যাতে পালাতে না-পারে, তাকে খুন করতে ব্যবস্থা নিয়েছিল ইকবাল, সফল হয়নি।

দেওয়ান গাজি, রহমের দণ্ড, ময়ূর পালক এলাকায় সম্প্রীতি ও কাঙাল মানুষের নিরাপত্তায় একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। সীমান্ত পাশপোর্ট কড়াকড়ি। আবার কোথাও কোথাও ফকিরের নিয়ম— নিমাই গাজির এলাকায় হিন্দুস্তান-পাকিস্তান নেই। দু'দেশের সরকার না-মানলে কী হবে এলাকার বাসিন্দারা মানে বলেই তারা অবাধে দু'পারেই যাতায়াত করে এখনও। নিমাই গাজি এক দেহের ভিতরে হিন্দু-মুসলমান হয়েই আছেন।

আমিনা, হিন্দু না মুসলমান? তার মা জলকে পানি বললে, মাকে আম্মা বললে ক্ষেপে যেত। সিঁদুর শাখাও পরত, তবু তাকে গোর দেওয়া হল গফুর মিঞার হুকুমে। দেওয়ানের মাজার স্পর্শ করে খইমুদ্দিন আমিনা শপথ নিয়েছিল এক সঙ্গে থাকার। নবদম্পতির সুখ

বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অসহ্য এক গরমের রাত শেষে ভোরে দাওয়ায় ঘুমিয়ে থাকা খইমুদ্দিনের পাশ থেকে ঘুমন্ত আমিনাকে মুখ চাপা দিয়ে তুলেছিল গফুর মণ্ডল। আমিনার চিৎকারে খইমুদ্দিন আসে। সড়কি এফোঁড় ওফোঁড় হতেই গফুর মণ্ডল বোঝে— মরে যাচ্ছে। গফুর মণ্ডল মরে যাচ্ছে তবুও সঙ্গমের স্পৃহা মেটেনি, তার সমস্ত লক্ষণ শরীর জুড়ে...

সড়কির ফলা গফুরকে ভেদ করে আমিনার বুকে গিয়ে বেঁধে... দেওয়ানের মাজারে রাখা ময়ূরের পালকের রহমের দণ্ড বাঁচাতে পারেনি আমিনাকে। আমিনাকে ভোলার জন্য সারারাত ক্যানেস্তারা বাজিয়ে যায় খইমুদ্দিন। শুধু বাদুড় তাড়াবার জন্য ক্যানেস্তারা বাজায়নি সে। এখনও জেগে আছি এ-কথা জানান দেবার জন্যই বাজায় সে। এই আওয়াজ যেন আল্লাহর দরবারে পৌঁছয়, সেখানে আমিনা তারই অপেক্ষায় আছে।

> 'মানুষের জন্মছকে উদ্বাস্তু হবার কোনও ইঙ্গিত থাকে না। থাকে পরিসংখ্যান। প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ এপারে চলে এসেছে। অনেকের আসাই হয়নি, যাত্রাপথেই নিহত হতে হয়েছে। তাদের অশরীরী হয়ে এপারে আসার কোনও হিসেব নেই। এই হিসেব দিনান্তের অবসরে প্রার্থনাতে উঠে আসে।
>
> প্রার্থনাজাত নৈঃশব্দই বলে দেয় দেশের এপার ওপার কোনওখানে সে নেই।।

এই না-থাকা মানুষ, মানুষ শুধু নয়, মানুষের ঘরবাড়ি, পশুপাখি, ফলপাকুড়, লোক ক্রীড়া, গান, নাচ, বাজনার জাদুমায়া, রহমের দণ্ড, মাজানের কালী... আরও আরও গুঁড়ো গুঁড়ো লৌকিক উপাদান হিন্দু-মুসলিম জীবনচর্যার ঐক্যসংহতি-টানাপোড়েনের এক অন্তর্গত দলিল, এই উপন্যাস। ভাগাভাগির সময়ে নিটোল বুননের কথকতা অসম্ভব। লেখক, কাহিনির লম্বা ছায়া প্রচ্ছায়া থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে গেছেন অনবরত। অথচ কাহিনির চম্বুক তো পুরো উপন্যাস জুড়েই। সেই জোড়, গ্রন্থিগুলি খুঁজতে গিয়ে পাঠককে দীক্ষিত হতে হয়। নাকালও হতে হয়। পীযূষ ভট্টাচার্যর সীমিত পাঠকের কারণটাও উপলব্ধি করা যায়।

১১২ পাতা জুড়ে পাঠকের চিন্তা, গতানুগতিক পঠন প্রক্রিয়ার অভ্যাস, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রতি বা দ্বেষের আজন্ম লালিত ধারণাকে দুরমুশ করেছেন পীযূষ।

'নড়ছে' এই শেষ শব্দটি, এককালীন সাম্যবাদী পছন্দের আশাবাদী উত্তরণ। কিন্তু কেন যে পাঠক আমি আটকে গেলাম খইমুদ্দিনেই:

> 'ফজরের আজান পর্যন্ত খইমুদ্দিন উদ্দাম ক্যানেস্তারা বাজিয়ে গেছে। এই একটানা আওয়াজের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে সকলেই মনে করবার চেষ্টা করে ঘুমোতে যাবার সময় এই ক্যানেস্তারার আওয়াজ নিশ্চয়ই সুরেলা-ঘুমপাড়ানির ছন্দ তুলেছিল না হলে ঘুম আসবেই বা কেন? মাঝরাতে পুরোপুরিই অন্যরকম ধ্বনি যা ঠিক আতঙ্ক নয় বরং এক ধরনের বিভ্রম। অথচ ঘুম আর আসছে না। সেজন্যই পাশে শুয়ে থাকা রমণীকে বিবস্ত্র করে নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে যায় সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে। তারপর ভূমিকম্পের মতন শীৎকার।

এসবের পর পাকাপাকিভাবে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছিল। তখন ক্যানেস্তারা ঢং ঢং করে তীব্রতায় পৌঁছে গেলেও কিছুতেই কিছু হবার নয়। এ সময়ে মানুষ কাঁদলে পাশের মানুষ টের পায় না সে জন্যই কেউ কাঁদেই না, কান্না ভুলে পাশাপাশি শুয়ে থাকে মৃত মানুষের মতন। আপ্রাণ এক চেষ্টা চলতেই থাকে জীবনের সব লক্ষণ মুছে ফেলবার।

এরকম যদি হয় কখনও তবে ধরেই নিতে হবে রক্তদহ বিলের মাছেরা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্রোতের বিপরীতে চলবার ছন্দ ভুলে একই জায়গায় লাফিয়ে উঠছে। তার ফলে দাঁড়ের শব্দ বলে ভুল করে বসছে সবাই। যেমন একই ভুল আবার করে বাদুড় তো আকাশ পথে ঝাঁপিয়ে নামছে, কালো টুপি মাথায় দিয়ে মজনুশাহ ফকিরের শিষ্যরা যেন!' চূড়ান্ত রৌরব। তবু কেন যে ফিরে এল কবেকার মাছ কাটা স্মৃতি:

'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউল গান ভাটু গান গাইতাম।'

লেখক কল্পনাপ্রবণ করে দিতে পারেন। অলৌকিক। এইখানেই অনন্যতা তার।

সূর্য যখন মেষ রাশিতে / পীযূষ ভট্টাচার্য
ভাষাবন্ধন প্রকাশনী / মূল্য: ১০০ টাকা